

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রশাসন ব্যবস্থা

আমরা ইতোপূর্বে রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সরকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের যন্ত্রস্বরূপ। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার কাজ করে। সরকারের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বা অঙ্গ রয়েছে। সাধারণভাবে সরকার বলতে আমরা বুঝি— আইন পরিষদ, রাজনৈতিক দল, মন্ত্রিপরিষদ, শাসনকর্তা, আদালত ও পুলিশ। সামগ্রিকভাবে সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে, যথা : ১. নির্বাহী বা শাসনবিভাগ, ২. আইনবিভাগ ও ৩. বিচার বিভাগ। প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এ তিনটি মৌলিক বিভাগ বিদ্যমান থাকে। কেননা, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি কাজ হচ্ছে প্রশাসন পরিচালনা, আইন প্রণয়ন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। প্রশাসন পরিচালনা দুই ধরনের— একটি কেন্দ্রীয় এবং অপরটি স্থানীয় শাসন। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হব।



এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- জাতীয় সংসদ এবং এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- জাতীয় সংসদ শাসনবিভাগকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব;
- জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা ও আইনের শাসন সম্বন্ধে বিচারবিভাগের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিচারপতি নিয়োগ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনসমূহের গঠন বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের উন্নয়নে স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারব;
- অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হব।

পরিচ্ছেদ ৭.১ : বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গসমূহ

নির্বাহী বা শাসনবিভাগ

রাষ্ট্রের শাসনকার্য তথা নিত্যদিনকার প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাষ্ট্রের সার্বিক সিদ্ধান্ত এবং সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন করে যে বিভাগ তাকে নির্বাহী বা শাসনবিভাগ বলে। বিস্তৃত অর্থে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভা, আমলা, নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, কূটনীতিক, দাপ্তরিক কর্মকর্তা এমনকি গ্রাম্য চৌকিদারসহ সকল প্রশাসনিক কর্মচারীদের নিয়ে নির্বাহী বা শাসনবিভাগ গঠিত।

আইনবিভাগ

সরকারের তিনটি বিভাগের একটি হলো আইনবিভাগ। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োজনবোধে প্রচলিত আইনের সংশোধন বা রদবদল করে থাকে। আইনবিভাগের একটি অংশ হলো আইনসভা বা পার্লামেন্ট। আইনসভা আইন প্রণয়ন করে। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনোনীত সদস্যদের নিয়ে এটি গঠিত হয়। আইনসভা প্রণীত আইন রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতি লাভের পর কার্যকর হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের আইনসভা রয়েছে। এসব আইনসভা বিভিন্ন নামে পরিচিত। বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেস আর ব্রিটেনের আইনসভা হলো পার্লামেন্ট। অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের আইনসভা মজলিশ নামে পরিচিত। কোনো দেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট আবার কোনো দেশের আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হয়ে থাকে। দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় উচ্চ পরিষদ ও নিম্ন পরিষদ থাকে। বাংলাদেশের আইনসভা অবশ্য এক কক্ষবিশিষ্ট। ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট।

বিচারবিভাগ

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। সরকারের যে বিভাগ আইন অনুসারে বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকে তাকে বিচারবিভাগ বলে। আইন ভঙ্গাকারীকে শাস্তি প্রদান, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার রক্ষা বহুলাংশে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রের সকল আদালত ও বিচারক নিয়ে বিচারবিভাগ গঠিত হয়।

১. নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা

পদমর্যাদায় রাষ্ট্রপতি সবার উপরে। সংবিধান অনুযায়ী তিনি রাষ্ট্রের প্রধান। সবার উর্ধ্বে তিনি স্থান লাভ করেন। সংবিধান ও আইন অনুযায়ী তাঁকে প্রদত্ত সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করেন। সংসদ প্রণীত আইন রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করেন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি

সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ তাঁর নামে পরিচালিত হয়। তাঁর হাতে কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই। দেশের সরকার গঠন, শাসন পরিচালনা, আইন প্রণয়ন এবং অর্থ, বিচার, প্রতিরক্ষা ও কূটনীতি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি সম্বাহন করেন। রাষ্ট্রপতির কার্যাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো—

১. প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ও শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি : সংসদ নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থাভাজন নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর পছন্দমতো মন্ত্রীদের নিয়ে সরকার গঠন করেন। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কারও পরামর্শ গ্রহণ করেন না। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাঁদের দস্তর বণ্টন করেন। তিনি অ্যাটার্নি জেনারেল, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্য বিচারকবৃন্দ, রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনারদের নিয়োগ দান করেন।

কাজ
দৃশ্যগত : রাষ্ট্রপতির কার্যাবলির
একটি ছক তৈরি কর।

২. সংসদবিষয়ক ক্ষমতা : রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান করেন। নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে ও নতুন বছরের অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণদান করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর সংসদে আলোচনা

হয়। সময়ে সময়ে রাষ্ট্রপতি সংসদে বাণী প্রেরণ করেন। তিনি সংসদ মূলতঃ রাষ্ট্রপতি রাখতে পারেন এবং প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শে তিনি সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন।

৩. অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা : সংসদ ভেঙ্গে গেলে বা অধিবেশন না থাকলে কোনো বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। এ অধ্যাদেশ সংসদ প্রণীত আইনের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন।
৪. প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ও বিচারসংক্রান্ত কাজ : রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কারও পরামর্শ গ্রহণ করেন না। সুপ্রিম কোর্টের অন্য বিচারপতিগণও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।
৫. ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা : রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা রয়েছে যে কোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করবার। কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যে কোনো দণ্ড তিনি মার্জনা করতে পারেন।
৬. অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা ও কাজ : সরকারি ব্যয়সংক্রান্ত কোনো বিল সংসদে উত্থাপন করতে হলে তাতে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ লাগে। প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি সংযুক্ত তহবিল থেকে ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করতে পারেন।
৭. প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত ক্ষমতা : বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত। তিনি বহির্ভাষিকরণ মোকাবিলায় যে কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির জরুরি ক্ষমতা

‘সংবিধানের ১৪১ এর ক (১) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন জরুরি অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাতে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের বাংলাদেশ বা যে কোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তাহা হইলে তিনি [অনধিক একশত কুড়ি দিনের জন্য] জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন।’

প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা

রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন সাংসদকেই (সংসদ সদস্য) প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারপ্রধান। তিনি সরকারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রধানমন্ত্রী সংসদ নেতা ও মন্ত্রিসভার প্রধান। তিনিই মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা সংসদের আস্থা হারালে সরকারের পতন ঘটে। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে দেশের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে আসছে।

সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা অনেক উপরে। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হলেও রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার মূলস্ফোরক। তিনি অত্যন্ত সম্মানজনক পদমর্যাদার অধিকারী। সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী তাঁর শাসন পরিচালনার জন্য সংসদের কাছে দায়ী থাকেন। ২০২৪ এর ছাত্র নাগরিকের গণ অভ্যুত্থানে পূর্বতন প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের পর সংসদে প্রধানমন্ত্রী পদের ক্ষমতা হ্রাস করার আলোচনা বিবেচনা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি

১. শাসন বিষয়ক ও নির্বাহী ক্ষমতা : প্রধানমন্ত্রী পুরো শাসনব্যবস্থায় নেতৃত্ব প্রদান করেন। সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেন। সকল নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের নিয়োগ ও তাঁদের দপ্তর বণ্টন করেন। বিচার, অর্থ, পররাষ্ট্র এবং শাসন

বিষয়ক সকল কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও মতামত অনুযায়ী পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রের উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ করেন।

২. আইনসংগ্রহ ক্ষমতা : আইন প্রণয়নে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি জাতীয় সংসদে সরকারি বিলের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে সংসদের আইন প্রণয়ন বিষয়ক কার্যাবলি পরিচালিত হয়।
৩. সংসদ পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা : প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা। তিনি সংসদের সাফল্যজনক সুষ্ঠু পরিচালনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। বিরোধী দলের আস্থা অর্জন ও সহযোগিতা পেতে তিনি নেতৃত্বদান করেন। সংসদে সকল সদস্যের অধিকার সংরক্ষণে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অনেক। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে সংসদ আহ্বান, স্থগিত বা ভেঙে দেন।
৪. অর্থবিষয়ক ক্ষমতা : প্রধানমন্ত্রী আর্থিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশক্রমে অর্থমন্ত্রী বাজেট প্রণয়ন ও সংসদে তা উপস্থাপন করেন। বাজেটে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক নীতির প্রতিফলন ঘটে। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহে অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করেন।
৫. রাষ্ট্রীয় কাজের সমন্বয়ে প্রধানমন্ত্রী : রাষ্ট্রীয় সকল কাজের সমন্বয় প্রধানমন্ত্রী করে থাকেন। তিনি যেহেতু প্রশাসনের কেন্দ্রে অবস্থান করেন তাই সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও অধিদপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনে তাঁর নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সভাপতিত্ব করেন।
৬. জাতির মুখপাত্র হিসেবে প্রধানমন্ত্রী : প্রধানমন্ত্রী জাতির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন। বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন এবং দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। যেকোনো জাতীয় সংকট সম্মুখে দেশবাসীকে অবহিত করেন। দেশের হয়ে বিবৃতি ও বক্তৃতা দেন।
৭. দলের নেতা : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী সরকারি দলের নেতা। সংসদ ও সংসদের বাইরে দলের নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখেন। দলীয় নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ভূমিকা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও বিরোধী দলের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং প্রধানমন্ত্রী দেশের শাসন পরিচালনা, আইন প্রণয়ন, অর্থব্যবস্থার তদারকি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। তিনিই সংসদ নেতা, মন্ত্রিসভার নেতা। তদুপরি শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু।

২. আইন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

সরকারের তিনটি বিভাগের একটি আইন বিভাগ। অন্য দুটি হলো শাসন ও বিচারবিভাগ। আইনবিভাগের প্রধান কাজ হলো দেশের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন ও পুরানো আইন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা। আইনবিভাগের একটি অংশ হলো আইনসভা। আইনসভা নির্বাচিত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত। এটি আইন প্রণয়ন করে। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতি লাভের পর কার্যকর হয়।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

বাংলাদেশের আইনসভার নাম 'জাতীয় সংসদ'। জাতীয় সংসদ আইনবিভাগের একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান। সংসদ প্রণীত আইন রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর কার্যকর হয়। আইনবিভাগ সরকারের একটি অংশ।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুসারে জাতীয় সংসদ মোট ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে ৩০০ জন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত। সংরক্ষিত আসন ছাড়াও নারীরা সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সদস্যদের ভোটে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবেন। সংসদের মেয়াদ ৫ বছর।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয় যা ১৯৭৫ থেকে রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থায় পরিণত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আনয়নের পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি চালু ছিল। ১৯৯১ এর পর বাংলাদেশে আইন প্রণয়ন, শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ, অর্থসংক্রান্ত তদারকি, নির্বাচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সংসদের বিভিন্ন রকম ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. আইন প্রণয়ন ক্ষমতা : সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নামে একটি আইনসভা থাকবে এবং এর ওপর প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ন্যস্ত হবে। সংবিধান অনুযায়ী সংসদ যে কোনো নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রচলিত আইন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারে। সংসদ আইনের মাধ্যমে যে কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ প্রদান, বিধি, উপবিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দিতে পারে। সংসদ প্রণীত আইনে রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে সম্মতি প্রদান করবেন।
২. সরকার গঠনবিষয়ক ক্ষমতা : সরকার গঠনে সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংসদের আস্থাভাজন ব্যক্তিই প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রধানমন্ত্রী সংসদের আস্থা হারালে সরকারের পতন হয়।
৩. অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা : রাষ্ট্রের অর্থ কীভাবে ব্যয় হবে তার ওপর সংসদ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। সংসদের অনুমোদন ও কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো প্রকার ব্যয় করা যায় না। আবার কোনো কর আরোপ বা কর সঙ্গ্রহ করতেও সংসদের অনুমতি নিতে হয়। প্রত্যেক অর্থবছরে সরকার সংসদে বাজেট উপস্থাপন করে। সংসদ অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী সরকারকে চলতে হয়। সংযুক্ত তহবিলের ব্যয়সমূহের ওপরও সংসদে আলোচনা হয়। মোটকথা রাষ্ট্রীয় ও সরকারি সকল ব্যয় সংসদের সম্মতির ভিত্তিতে করতে হয়।
৪. বিচারবিষয়ক ক্ষমতা : সংসদ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত করতে পারে। সংবিধান লঙ্ঘন, গুরুতর অপরাধ, দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতা ও অক্ষমতার জন্য সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে পারে। প্রয়োজনে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও ন্যায়পালকে অপসারণ করার ক্ষমতাও সংসদের রয়েছে। এ জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিচার সংক্রান্ত কাজ সংসদ পরিচালনা করে।
৫. নির্বাচনসংক্রান্ত কাজ : জাতীয় সংসদ নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, ন্যায়পাল ইত্যাদি পদের নির্বাচনি ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত। সংসদের বিভিন্ন কমিটি নির্বাচন করার ক্ষমতাও সংসদের রয়েছে।
৬. সংবিধান সংরক্ষণ ও সংশোধন : সংবিধানের আমানতদার হিসেবে সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবিধানের যে কোনো সংশোধনীও সংসদে উত্থাপিত ও গৃহীত হয়।
৭. অন্যান্য ক্ষমতা : সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত অন্যান্য আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে। যুদ্ধ ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন করার ক্ষমতাও সংসদের। স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত বিধি ও প্রবিধান সংসদ প্রণয়ন করে।

কাজ
একক : জাতীয় সংসদের কার্যাবলি
একটি তালিকা তৈরি কর।

জাতীয় সংসদ কর্তৃক শাসনবিভাগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। এ নিয়ন্ত্রণ আইনবিভাগ দ্বারা কার্যকর করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে শাসন সংক্রান্ত সকল কাজের জন্য সংসদের কাছে দায়ী থাকতে হয়। সরকার সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সংসদ সরকারের যে কোনো ভাগে কাজের যেমন প্রশংসা করতে পারে, তেমনি সরকারের যে কোনো মন্দ কাজের সমালোচনাও করতে পারে। সরকারকে সকল শাসনসংক্রান্ত কাজের জন্য সংসদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। সংসদ মূলত বি প্রস্তাব, নিষিদ্ধ প্রস্তাব, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের প্রতি প্রশ্ন বা অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে শাসনবিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সংসদ সদস্যদের আস্থা হারালে যে কোনো মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের অর্থ হলো, সম্পূর্ণ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ। এরূপ অবস্থা হলে দেশে আবার নতুন করে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৩. বিচারবিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

বিচার বিভাগের স্বাভাবিক এবং স্বাধীনতা বাংলাদেশ সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিচারবিভাগ সুসংগঠিত ও সুপরিচালিত। বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান বহির্ভূত বিধানকে অবৈধ ঘোষণা করে শাসনতন্ত্রকে সুনির্দিষ্ট গতিপথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের বিচারবিভাগ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে আইনের অনুশাসনকে অক্ষুণ্ণ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সজীব রাখে।

বিচার ব্যবস্থা একটি দেশের ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। বিচার বিভাগ ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দক্ষ শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে এর ক্ষমতা ও কার্য পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। বিচার বিভাগের কাজ হলো—

১. ন্যায়বিচার করা : বিচারবিভাগের প্রধান কাজ প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং আইন অমান্যকারীর বিচার করা। এক্ষেত্রে বিচারকগণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে আইন অনুযায়ী ন্যায়নীতির ভিত্তিতে বিচারকার্য সম্পন্ন করেন। বিচার বিভাগ সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। দেওয়ানি, ফৌজদারি প্রভৃতি মামলার সত্য ঘটনা অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিচারবিভাগ অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে।
২. আইন তৈরি : সাধারণত আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রয়োগের দায়িত্ব বিচারবিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকে। এছাড়া বিচারকগণ নতুন আইন সংযোজন করে থাকেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচার করতে গিয়ে উপযুক্ত আইন খুঁজে পাওয়া না গেলে বিচারকগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিচারের রায় প্রদান করেন যা আইন হিসেবে বিবেচিত হয়।
৩. মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ : জনগণের মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে। এ অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব বহুগাংশে আদালতের ওপরই ন্যস্ত হয়।
৪. আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রয়োগ : বিচারবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা এবং সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আইন প্রয়োগ করা। আইন বলতে সাধারণত সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন, শাসনতান্ত্রিক আদেশ বা অর্ডার এবং বিভিন্ন প্রথাগত আইনকে বোঝানো হয়।
৫. সংবিধান রক্ষা করা : সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে বিচারবিভাগ কাজ করে। বিচারবিভাগ সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার গুরুত্ব অপরিসীম; সেখানে সুপ্রিম কোর্ট প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী।

৬. বিরোধের নিষ্পত্তি : রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিভিন্ন সময় বিরোধ দেখা যায়। বিচারবিভাগ এ ধরনের বিরোধের মীমাংসা করে থাকে।

কাজ
দলগত : বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কার্যাবলির একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

৭. শাসনবিভাগকে পরামর্শ প্রদান : শাসন বিভাগের অনুরোধে বিচারবিভাগ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

৮. বিবিধ কার্যাবলি : বিচারবিভাগ বিদেশি নাগরিকদের নাগরিকত্ব দান, অভিভাবকত্ব নিরূপণ, নাবালকের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানসহ বিবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

অধিকার সুরক্ষা ও আইনের শাসন সংরক্ষণে বিচারবিভাগের ভূমিকা

বিচারবিভাগ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। ব্যক্তির মৌলিক অধিকার যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্য বিচারবিভাগ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, বিচারবিভাগ ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে। নাগরিকদের নাগরিক অধিকার ও সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার রক্ষা করার মাধ্যমেই এ বিভাগ ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। এ অধিকার সংরক্ষণ করতে গিয়ে বিচারবিভাগকে কয়েকটি বিশেষ হুকুমনামা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। এ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে: ১. ম্যানডেমাস রিট, ২. সার্টিওয়ারি রিট, ৩. প্রহিবিশন রিট, ৪. হেবিয়াস কর্পাস রিট, ৫. কোওয়ারেন্টো রিট ইত্যাদি। এ সকল রিট (Writ) আবেদন বা হুকুমনামাগুলো জারি করার ক্ষমতা বিচারবিভাগের রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে অধিকারবঞ্চিত যে কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে বিচার বিভাগ সর্বশ্রুতি ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে বিচারের জন্য আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দিতে পারে।

বিচারপতি নিয়োগ ব্যবস্থা

বিচারপতি নিয়োগ পদ্ধতি বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার প্রথম পদক্ষেপ। বিভিন্ন দেশের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যথা— জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচন, আইনসভা কর্তৃক নির্বাচন, শাসনবিভাগের প্রধান কর্তৃক নিয়োগ প্রভৃতি। বাংলাদেশ সংবিধানে বিচারকদের নিয়োগ সংক্রান্ত যোগ্যতার শর্তাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি কতিপয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে বিচারকদের নিয়োগ প্রদান করেন। এটাই হলো এদেশে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অন্যান্য দুটি পদ্ধতিতে বিভিন্ন জটিলতা থাকায় বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্র সাধারণত শাসনবিভাগের প্রধান কর্তৃক বিচারপতি নিয়োগ করে থাকে। প্রধান বিচারপতি ও উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের নিয়োগ সাধারণত রাষ্ট্রপতি দিয়ে থাকেন। তবে অধস্তন আদালতসমূহের বিচারকগণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

পরিচ্ছেদ ৭.২: বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা

একটি দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির জন্য সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রশাসনিক শিথিলতা নৈরাজ্যের পরিস্থিতির জন্য দিতে পারে। প্রশাসনিক কার্যক্রমের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন প্রশাসনের সাথে জনগণের সহযোগিতা। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের অধীনে একটি প্রদেশ। এদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল প্রাদেশিক। পাকিস্তান শাসনামলে এদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গণমুখী হয়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার পর পুরাতন প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনেকটা যুগোপযোগী করার প্রয়োজন পড়ে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির পরিবর্তে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বর্তমান

বাংলাদেশের প্রশাসনিক স্তরগুলো হলো: ১. কেন্দ্র, ২. বিভাগ, ৩. জেলা ও ৪. উপজেলা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বা অধিদপ্তর নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থা গঠিত। শাসনসংক্রান্ত এক বা একাধিক বিভাগ একটি মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত। একটি মন্ত্রণালয়ের প্রধান হলেন মন্ত্রী। আর সচিব হচ্ছেন মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। প্রতিটি বিভাগের বা মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত রয়েছে বিভাগ বা অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের প্রধান হলেন মহাপরিচালক। এছাড়া এসব অধিদপ্তরের অধীনে পূর্ণ বা আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বোর্ড ও কর্পোরেশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত আইন, নীতিমালা, কর্মসূচি কিংবা প্রকল্পের বাস্তবায়ন এসব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সরকারি কর্মকর্তা তথা আমলাদের প্রশাসন পরিচালনার ভিত্তি হলো সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের জ্ঞান এবং প্রশাসনিক কাজ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন

সেক্রেটারিয়েট বা সচিবালয় বাংলাদেশ প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থিত যা শাসনব্যবস্থার দ্বায়কেন্দ্র স্বরূপ। সরকারি যাবতীয় সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম সচিবালয়ে গৃহীত হয়। সাধারণত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তার বিভাগসমূহের অফিসগুলোকে যৌথভাবে সচিবালয় বলে। প্রধানমন্ত্রীর পছন্দানুযায়ী প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। মন্ত্রী হলেন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি ও মন্ত্রণালয়ের প্রধান। মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তথা প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন সচিব। সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে সেবা, যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ এবং নির্দিষ্ট পদসোপানের মধ্য দিয়ে তিনি সচিব পদে উন্নীত হন। মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কাজের ভার সচিবের ওপর ন্যস্ত থাকে। তিনি মন্ত্রীকে যাবতীয় কাজে সহায়তা করেন। মন্ত্রণালয় পরিচালনার ব্যাপারে মন্ত্রী সচিবের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে সচিব মন্ত্রীর সহচর হিসেবে কাজ করেন।

বাংলাদেশের প্রশাসনের দুটি স্তর রয়েছে। যেমন: কেন্দ্রীয় প্রশাসন এবং মাঠ প্রশাসন। কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর পদসোপান অনুযায়ী সর্বনিম্ন স্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হচ্ছেন সহকারী সচিব। ধাপের ক্রমানুসারে কর্মকর্তাদের পদবি যথাক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব, উপসচিব, যুগ্ম সচিব, অতিরিক্ত সচিব, সচিব, সিনিয়র সচিব এবং সবার উপরে মন্ত্রী অবস্থান করেন। পদসোপানটি পাশে চিত্রিত হলো। প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড এই কাঠামো স্তরের মধ্য দিয়েই বাস্তবায়িত হয়। সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ উপর থেকে নিচের দিকে যায়। সচিবের পরামর্শ ছাড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন কোনো বিভাগীয় প্রধান, সরাসরি মন্ত্রীর কাছে কোনো প্রস্তাব বা সুপারিশ পাঠাতে পারেন না। একটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একাধিক সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব বা অধস্তন কর্মকর্তা থাকতে পারেন। তবে কর্মকর্তাদের সংখ্যা কতজন হবে তা মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব ও কার্যাবলির ব্যাপকতার ওপর নির্ভর করে।

সচিবালয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত ক্রমান্বয়ে বিভাগে, জেলা প্রশাসনে এবং উপজেলা প্রশাসনে প্রেরিত হয়। তাই দেখা যায় যে, সচিবালয় বাংলাদেশ প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। সকল বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থাসমূহ সচিবালয়ের কাছে দায়ী।



স্রব: পদ সোপান

বাংলাদেশে স্থানীয় প্রশাসনের গঠন ও কাজ

প্রত্যেক রাষ্ট্রে কোনো না কোনোরূপ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এর প্রকৃতি বা ধরন এক ও অভিন্ন নয়। একটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ন্যায় এর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাও অন্য আরেকটি দেশ থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এই ভিন্নতার মূলে রয়েছে, একটি নির্দিষ্ট দেশের ভৌগোলিক অবস্থা, জাতিসত্তা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতা, পরিবর্তন ধারা, উৎপাদন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ইত্যাদি। বাঙালি জাতিরাষ্ট্র গঠনের মতো আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাও নানা ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। সময়ে সময়ে এখনও তা পুনর্বিন্যস্ত হচ্ছে।

স্থানীয় প্রশাসন

স্থানীয় শাসন বলতে সাধারণত স্থানীয় পর্যায়ের তথা বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা শাসন ব্যবস্থাকে বুঝায়। প্রশাসনের সুবিধার্থে এর সৃষ্টি। এ প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় শাসন ও নিয়ন্ত্রণকে নিম্নতর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, রাজস্ব আদায় ও সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ ব্যবস্থায় স্থানীয় শাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিবৃন্দ সরকারের এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য। উদাহরণ হিসেবে আমাদের দেশে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কথা উল্লেখ করা যায়।

বিভাগীয় প্রশাসন

কেন্দ্রের পরেই বাংলাদেশে বিভাগীয় প্রশাসনের স্থান। বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুস্থভাবে পরিচালনার জন্য সমগ্র দেশকে ৮টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে— ১. ঢাকা বিভাগ ২. চট্টগ্রাম বিভাগ ৩. রাজশাহী বিভাগ ৪. খুলনা বিভাগ ৫. বরিশাল বিভাগ ৬. সিলেট বিভাগ ৭. রংপুর বিভাগ ও ৮. ময়মনসিংহ বিভাগ। বিভাগীয় প্রশাসনের শীর্ষে অবস্থান করেন বিভাগীয় কমিশনার।

বিভাগীয় কমিশনার বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি একজন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা। তিনি মূলত বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব বিষয়ক কর্মকর্তা। বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকদের কার্যাবলি তদারকি করেন। তিনি বিভাগীয় প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। বিভাগের জনকল্যাণমূলক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন তাঁর দায়িত্ব। সাহায্য ও সেবামূলক কাজ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদিও তাঁকে করতে হয়। বস্তুত তিনি বিভাগ পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন।

জেলা প্রশাসন

জেলা প্রশাসন বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর তৃতীয় স্তর। প্রত্যেক বিভাগ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৪টি জেলা রয়েছে। জেলা প্রশাসককে কেন্দ্র করে জেলার সমগ্র শাসন আবর্তিত হয়। জেলা প্রশাসক বা ডেপুটি কমিশনার হলেন জেলা প্রশাসনের মধ্যমণি। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। তিনি প্রশাসনের উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা।

জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কেন্দ্রের যোগসূত্র বিদ্যমান। বাংলাদেশ সচিবালয়ে জেলাসংক্রান্ত গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত সরাসরি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরিত হয়। জেলা প্রশাসক কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেলা প্রশাসন পরিচালনা করেন। আর জেলা প্রশাসকদের কেন্দ্র করেই জেলার প্রশাসন পরিচালিত ও আবর্তিত। জেলা প্রশাসক তাঁর কাজের জন্য

বিভাগীয় কমিশনারের কাছে দায়ী। বিভাগীয় কমিশনার আবার যাবতীয় কার্যাবলির জন্য কেন্দ্রের নিকট দায়ী। বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে জেলা ও কেন্দ্রের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যাবলি ব্যাপক। জেলা প্রশাসক প্রধানত রাজস্বসংক্রান্ত, সমন্বয়সংক্রান্ত, স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত এবং সেবামূলক কাজ করে থাকে।

উপজেলা প্রশাসন

উপজেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক স্তর। প্রতিটি জেলা কয়েকটি উপজেলায় বিভক্ত। বর্তমানে দেশে ৪৯৫টি উপজেলা রয়েছে। উপজেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তা হলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। তিনি জেলা প্রশাসকের আদেশ বাস্তবায়ন এবং উপজেলার অন্যান্য কাজের সমন্বয় করে থাকেন। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন সদস্য। উপজেলা পর্যায়ের অন্য কর্মকর্তাদের সহায়তায় উপজেলার সকল উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। এছাড়া উপজেলার শাসন ব্যবস্থা ও শান্তি-শৃঙ্খলার কাজও তিনি দেখাশুনা করেন। মূলত উপজেলার সকল উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজ তদারক করা তাঁর দায়িত্ব।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলতে নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক জনগণের স্বশাসনকে বুঝায়। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা তা পরিচালিত হয়। প্রতিনিধিরা তাঁদের কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— ক. আইনগত ভিত্তি, খ. নির্বাচিত সংস্থা, গ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ, ঘ. করারোগের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের ক্ষমতা, ঙ. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, চ. কেন্দ্রীয় বা বিভাগীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে কার্য পরিচালনা প্রভৃতি। এটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা সরকার পরিচালনা পদ্ধতির পরিশীলিত রূপ। বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো— ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রভৃতি।

ইউনিয়ন পরিষদ

ইউনিয়ন পরিষদ এদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশপূর্ব আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গ্রাম এলাকার জনপ্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটি কাজ করেছে। ব্রিটিশ আমলে গ্রাম এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করার জন্য চৌকিদারি পদ্ধতিতে আইন ১৮৭০ প্রবর্তিত হয়। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গ্রামে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করার জন্য এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৮৮৫ সালে স্থানীয় পর্যায়ে অধিক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গীয় স্থানীয় আইন পাশ হয়। এই আইনে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি, মহকুমা পর্যায়ে মহকুমা বোর্ড ও জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯১৯ সালের পন্থি আইনে চৌকিদারি পদ্ধতিতে ও ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন বোর্ড নামে একটিমাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাকিস্তান আমলে এর নাম হয় ইউনিয়ন কাউন্সিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ—এই তিন স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধিত আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। সাধারণত গড়ে ১০-১৫টি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত। ইউনিয়ন পরিষদে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, নয় জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য ও তিনজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত আসনে) থাকবেন। পূর্বে একটি ইউনিয়ন তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল। সংশোধিত আইনে ওয়ার্ড সংখ্যা ৯ (নয়) টিতে উন্নীত করা হয়েছে। প্রত্যেক

ওয়ার্ড থেকে একজন করে মোট নয়জন সাধারণ সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। প্রতি ৩ ওয়ার্ডে একজন মহিলা সদস্য পুরুষ ও মহিলা সকলের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর। বাংলাদেশে সর্বমোট ৪,৫৭৮টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ প্রধানত জনশৃঙ্খলা রক্ষা, স্থানীয় উন্নয়ন, প্রশাসনিক কাজ ও জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

উপজেলা পরিষদ

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার এটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট উপজেলা পরিষদ। দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯২টি উপজেলায় স্থানীয় জনগণের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ গঠনের বিধান রয়েছে। উপজেলা ব্যবস্থা ১৯৮৩ সালে প্রথম প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থাটি বিভিন্ন কারণে পরবর্তীতে সময়ে স্থায়ীরূপ লাভ করেনি। এ লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ পুনঃপ্রচলন এবং উক্ত আইনের অধিকতর সংশোধনকরে ৬ এপ্রিল ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ আইন পাশ হয়। এ আইন ‘উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন ২০০৯’ নামে পরিচিত।

আইনের বিধান অনুযায়ী নিম্নোক্তদের সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হবে:

- ক. চেয়ারম্যান
- খ. ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান (যার মধ্যে একজন নারী)
- গ. উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান
- ঘ. উপজেলার এলাকাভুক্ত পৌরসভার মেয়র ও
- ঙ. সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যগণ।

চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হবেন। উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ ও পৌরসভার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের সমসংখ্যক আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, যারা উক্ত উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্য বা কাউন্সিলরগণ কর্তৃক তাদের মধ্য হতেই নির্বাচিত হবেন।

উপজেলা পরিষদ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করবে। সকল কাজের সফলতা নির্ভর করবে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

জেলা পরিষদের গঠন প্রণালি

বাংলাদেশ সরকার ৬ জুলাই ২০০০ সালে ‘জেলা পরিষদ আইন ২০০০’ প্রবর্তন করে। আইনের বিধান অনুযায়ী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, রাজশাহী পার্বত্য জেলা ও বান্দরবান পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতীত অন্য জেলায় জেলা পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। একজন চেয়ারম্যান, পনেরো জন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনের পাঁচজন নারী সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত। একটি জেলা পরিষদের মেয়াদ বা কার্যকাল থাকবে পাঁচ বছর। জেলা পরিষদ প্রধানত জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম, পাঠাগার ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে থাকে।

পৌরসভা

শহর এলাকার স্থানীয় শাসন সংস্থাটির নাম পৌরসভা। বাংলাদেশে প্রত্যেক পৌর বা শহর এলাকার জন্য একটি করে পৌরসভা আছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট বড়ো মোট ৩৩১টি পৌরসভা রয়েছে।

গঠন

প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন মেয়র এবং ওয়ার্ডভিত্তিক নির্বাচিত সদস্য নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। সদস্যগণ কাউন্সিলর নামে পরিচিত। দেশের সকল পৌরসভার সদস্য সংখ্যা সমান নয়। পৌর এলাকার আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে সদস্য সংখ্যা কমবেশি হতে পারে। পৌরসভার কার্যকাল পাঁচ বছর।

পৌরসভামূলত শহর এলাকার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়নকল্পে বহুবিধ কাজ করে থাকে।

সিটি কর্পোরেশন

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, কুমিল্লা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ পৌরসভাকে সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তর করা হয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে আইনের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ নামে দুটি কর্পোরেশন হিসেবে বিভক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে ১২টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে।

সিটি কর্পোরেশনের এলাকা ও কাজের ওপর এর সদস্যসংখ্যা নির্ভর করে। কর্পোরেশনে একজন মেয়র আছেন। তাঁরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

শহরের নানাবিধ সমস্যা, যেমন- পানীয়জলের ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন, ময়লা-আবর্জনা অপসারণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে।

স্থানীয় শাসনের মতো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোও একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের জীবনধারা উন্নত করার জন্য অপরিহার্য।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব

আধুনিককালে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব যে কত বেশি তা বদার অপেক্ষা রাখে না।

বর্তমানে রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা বিশাল। রাজধানীতে বসে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক পক্ষে দেশের সর্বত্র সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা, নানা বিষয়ে দৈনন্দিন নজর রাখা, স্থানীয় সমস্যা সমাধানে কার্যকর ও সঠিক সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ, উন্নয়ন কর্মকান্ড ত্বরান্বিত ও অঞ্চল নির্বিশেষে সুখম উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা দ্বারা তা সহজসাধ্য হয়।

কাজ

দলগত : স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব নিয়ে একটি বিভক্তিমূলক আলোচনা কর।

স্থানীয় শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব হলো এটি কেন্দ্রের মুখাপেক্ষিতা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতামুক্ত। এ ব্যবস্থার স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও স্থানীয় উন্নয়নে ত্বরিত উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়। এ ব্যবস্থা স্থানীয় শাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব সৃষ্টি করে। প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। ফলে গণতন্ত্রের ভিত সুদৃঢ় হয়। রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা হয় উন্নত।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সরকারের তিনটি মৌলিক বিভাগের নাম লিখ।
২. জাতীয় সংসদ কীভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে? ব্যাখ্যা কর।
৩. স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।
২. 'জাতীয় সংসদই শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে'— উক্তিটি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে লিখ।
৩. বিচার বিভাগ কীভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে— ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা আছে এমন দেশের উদাহরণ নিচের কোনটি?
 - ক. যুক্তরাষ্ট্র
 - খ. যুক্তরাজ্য
 - গ. ভারত
 - ঘ. বাংলাদেশ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

হৃদয় তার প্রবাসী বন্ধুকে জানায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সরকারি বিলের পৃষ্ঠপোষকতা, অর্থবিষয়ক কাজ, দলের নেতা, সংসদবিষয়ক ক্ষমতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

২. জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে হৃদয় প্রদত্ত কোন তথ্যটি সঠিক?
 - i. সরকারি বিলের পৃষ্ঠপোষকতা করা
 - ii. বার্ষিক বাজেট অনুমোদন
 - iii. সংসদ সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৩. উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বলা হয়—

- ক. সরকার প্রধান
- খ. নির্বাহী প্রধান
- গ. সংসদ প্রধান
- ঘ. দলীয় প্রধান

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জনাব 'ক' কালেক্টর হিসেবে কাজ করেন। তিনি তার এলাকার সকল সরকারি দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেন। তিনি তার এলাকার একজন বিচারকের কাজও করেন।
 - ক. বর্তমানে আমাদের দেশে কয়টি পৌরসভা আছে?
 - খ. 'স্থানীয় প্রশাসন' ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
 - গ. আমাদের দেশে জনাব 'ক' এর অবস্থান বর্ণনা কর।
 - ঘ. উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর যে ধরনের কাজের প্রতিফলন ঘটেছে তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।